

আম-আঁটির ভেঁপু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[লেখক-পরিচিতি : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালে ২৪ পরগনার মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহানন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা মৃণালিনী দেবী। স্থানীয় বনগ্রাম স্কুল থেকে ১৯১৪ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন এবং কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ. এবং বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি হুগলী, কলকাতা ও ব্যারাকপুরের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শরৎচন্দ্রের পরে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবন-যাপনের অসাধারণ এক আলেখ্য নির্মাণ করে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনের অভিন্ন সম্পর্কের চিরায়ত তাৎপর্যে তাঁর কথাসাহিত্য মহিমামণ্ডিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : পথের পাঁচালী, অপরাহ্ন, অরণ্যক, ইছামতি, দৃষ্টিপ্রদীপ। গল্পগ্রন্থ : মেঘমল্লার, মৌরীফুল, যাত্রাবদল। ইছামতি উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোটো টিনের বাস্র আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাস্রের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে- একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু নিজের পুতুলের বাস্রে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাস্রে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগত কৌতূহল হইয়া তাহাকে একপাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিজরাপোলের আসামির ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁইয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কি না।

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল-অপু- ও অপু-। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল- কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল- আয় এদিকে- শোন-

দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপূর মতো অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ- বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপূর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপূরোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল,- কে রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা! সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা।
সুর নিচু করিয়া বলিল— মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল— উঁহু—

দুর্গা চুপিচুপি বলিল — একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমার কুশি জারাবো —

অপু আল্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল — কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল — আন্ দিকি একটু নুন আর তেল!

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল — তেলের ভাঁড় ছুলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

— তুই যা না শিগগিরি করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি-স্কার কাচতে গিয়েচে শিগগিরি যা—

অপু বলিল— নারিকেলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো— তুই খিড়কি দোরে গিয়ে
দ্যাখ মা আসচে কি না।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল— তেলটেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—
তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ি মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ
করিয়া মাখিল,— বলিল, নে হাত পাত।

— তুই অতগুলো খাবি দিদি?

— অতগুলি বুঝি হলো? এই তো— ভারি বেশি— যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা— বাঃ, দেখতে বেশ
হয়েচে রে, একটা লস্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তা হলে—

— লস্কা কী করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাই নে?

— তবে থাকগে যাক্ — আবার ওবেলা আনবো এখন—পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা
ধরেচে — দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা
গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও
জঙ্গলাবৃত্ত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ি নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে
ভুবন মুখুয্যের বাড়ি।

হরিহরের বাড়িটাও অনেকদিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে
বন— বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে— ঘরের দোর— জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের
দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কি দোর ঝানাং করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল— দুগ্গা, ও দুগ্গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকছে, যা দেখে আয়— ওখানা খেয়ে যা— মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোথাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান্ মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল— মুখটা মুছে ফ্যাল না বাঁদর, নুন লেগে রয়েছে যে ...

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল— কী মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা— গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি কুটোগাছটা ভেঙে দু খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন— সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে!

—রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু ... একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও! তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই—ফরমাজ! ও দুগ্গা, দ্যাখ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বাঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এটু আটা বের করো না মা, মুকে বড্ড লাগে!

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল— চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল— উঃ, চিবনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রুকুটিমিশ্রিত চোখটেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল,— আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল— তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল— ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি— এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে— তুমি যখন ডাকলে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল— যা, বাছুরটা ধরগে যা— ডেকে সারা হোলো— কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা হাতার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল— লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল— আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে— আবার কোনোদিন আম দেবো খেও— ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়— দেবো তোমায়? খেও এখন? হাবা একটা কোথাকার— যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অনুদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল— অপুকে দেখিচি নে?

সর্বজয়া বলিল— অপু তো ঘরে ঘুমুচ্ছে।

—দুগ্গা বুঝি—

—সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে— সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে— কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে— এই চন্ডির মাসের রোদুদুরে, ফের দ্যাখো না এই জুরে পড়লো বলে— অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল— আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক, খুব মাতবর, পাঁচটা—ছয়টা গোলা বাড়িতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক— আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে—

দাদাঠাকুর, আমায় চিনতে পাচ্ছেন? আমি বল্লাম— না বাপু, আমি তো কৈ?— বল্লে— আপনার কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচ্চায় সবসময়ই তিনি আসতেন, পায়ের ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি— তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি— আপনিই কেন মন্তরটা দেন না? তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কোনো কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু- এক-দিনে— বুঝলে?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেজেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল— হ্যাঁগো, তা মন্দ কী? দাও না ওদের মন্তর? কী জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল— বলো না কাউকে!— সদগোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—

—আমি আবার কাকে বলতে যাবো, তা হোক গে সদগোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে— ঐ রায়বাড়ির আটটা টাকা ভরসা, তাও দু’তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়— আর এদিকে রাজ্যের দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকুরন বল্লে— বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিই নে— তবে তুমি অনেক করে বল্লে বলে দিলাম— আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্ছে, দু’বেলা তাগাদা আরম্ভ করেছে। ছেলেটার কাপড় নেই— দু’তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়— আমার এমন হয়েছে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই—

—আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এই গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা— জমি দিয়ে বাস করাই— গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড় ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজি— পয়সার তো অভাব নেই! আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা— ভদ্র লোকেরই হয়ে পড়েছে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল- এখুনি। তা তুমি রাজি হলে না কেন? বল্লেই হতো যে আচ্ছা আমরা আসবো! ও রকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়- এ গাঁয়ে তোমার আছে কী? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা-

হরিহর হাসিয়া বলিল- পাগল! তখুনি কি রাজি হতে আছে? ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখিচি শিকেয় উঠেচে- উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়- তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে- আর এখন ওঠ বল্লেই কী ওঠা চলে? সব ব্যাটা এসে বলবে টাকা দাও, নৈলে যেতে দেবো না- দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়-

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ওধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কী কতকগুলো যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষত মার সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ি ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কী করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুকনো রড়া ফলের বিচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুনিতে আরম্ভ করিল, এক-দুই-তিন-চার ... ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বিচি হাতের উল্টা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল - অপুকে এইগুলো দেবো - আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো-

কেমন বিচিগুলি তেল চুকচুক কচ্ছে- আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নৈলে সব গোরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙি গাইটা একেবারে রান্নাস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হলো।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বিচি আবার সম্বলে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কী ভাবিয়া রক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল। □

শব্দার্থ ও টীকা : রোয়াক - ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দা। চুপড়ি - ছোটো ঝুড়ি, ক্ষুদ্র ধামা। নাটাকল - করঞ্জা ফল খাপরার কুচি - কলসি-হাঁড়ি প্রভৃতির ভাঙা অংশ বা টুকরা। পিজরাপোলের আসামি - খাঁচায় পড়ে থাকা অবহেলিত আসামির মতো অর্থে। দাওয়া - বারান্দা। আমের কুসি - কচি আম। জারা - জীর্ণ করা, কুচি কুচি করা অর্থে। বন-বিছাটি - বুনো গাছ।

পাঠ-পরিচিতি : ‘আম আঁটির ভেঁগু’ শীর্ষক গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাস থেকে সংকলন করা হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের আনন্দিত জীবনের আখ্যান নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। অপু ও দুর্গা হতদরিদ্র পরিবারের শিশু। কিন্তু তাদের শৈশবে দারিদ্র্যের সেই কষ্ট প্রধান হয়ে ওঠেনি। গ্রামীণ ফলফলাদি খাওয়ার আনন্দ এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের বিস্ময় ও কৌতূহল গল্পটিকে মানুষের চিরায়ত শৈশবকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গল্পের সর্বজয়া পল্লি-মায়ের শাস্বত চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে শিশুর আনন্দপূর্ণ শৈশব এবং প্রকৃতির সম্পর্ক দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ গল্প শিশু-কিশোরকে প্রকৃতিমুখী হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১. 'আম আঁটির ভেঁপু' গল্পে যে সকল গ্রামীণ উপাদান ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
২. তোমার পঠিত আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের অনুরূপ গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা সংবলিত অন্য একটি গল্পের আলোচনা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। উঠানের কোন জায়গা থেকে দুর্গা অপুকে ডাকছিল?
ক. আমতলা খ. বটতলা
গ. কাঁঠালতলা ঘ. জামতলা
- ২। তেলের ভাঁড় ছুঁলে দুর্গাকে মারার কারণ হচ্ছে—
i কুসংস্কার
ii অপচয়
iii না জানানো
- নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপন ও রুমা দুই ভাই-বোন। তাদের বয়সের পার্থক্য চার বছর। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন জিনিস একে অন্যকে তারা দেখাতে চায় না। রুমার খেলার সামগ্রী রিপন লুকিয়ে রাখে। রুমার বিভিন্ন আদেশ, আবদার রিপন মানতে চায় না। এই নিয়ে ওদের মাকে নানা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়।

৩। উদ্দীপকটি ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের কোন দিককে প্রতিফলিত করেছে?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ক. ভাই-বোনের সম্পর্ক | খ. ভাই-বোনের বিরোধ |
| গ. ভাই-বোনের আবদার | ঘ. মায়ের চিন্তা |

৪। উদ্দীপকের ভাবনা ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের কোন উদ্ধৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- | |
|--|
| ক. নারকেলের মালাটা আমায় দে |
| খ. তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত |
| গ. দুর্গার হাতে একটি নারিকেলের মালা |
| ঘ. একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুশি জারাবো |

সৃজনশীল প্রশ্ন

একই পরিবারের মকবুল, আবুল, সুরত সবাই বেশ পরিশ্রমী। নিজেদের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গাচাষ করে, লাকড়ি কাটে, মাঝিগিরি করে, কখনো কখনো অন্যের বাড়িতে কামলা খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের স্ত্রীরাও বসে নেই। ভাগ্যের উন্নতির জন্য পাতা দিয়ে পাটি বোনে, বাড়ির আঙিনায় মরিচ, লাউ, কুমড়া ফলায়, বিল থেকে শাপলা তুলে বাজারে বিক্রি করে। কোনো রকমে জীবন চলে যাচ্ছে তাদের।

ক. দুর্গার বয়স কত?

খ. বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হলো না কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পের মূলভাবকে কতটুকু ধারণ করে?”—যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।